পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

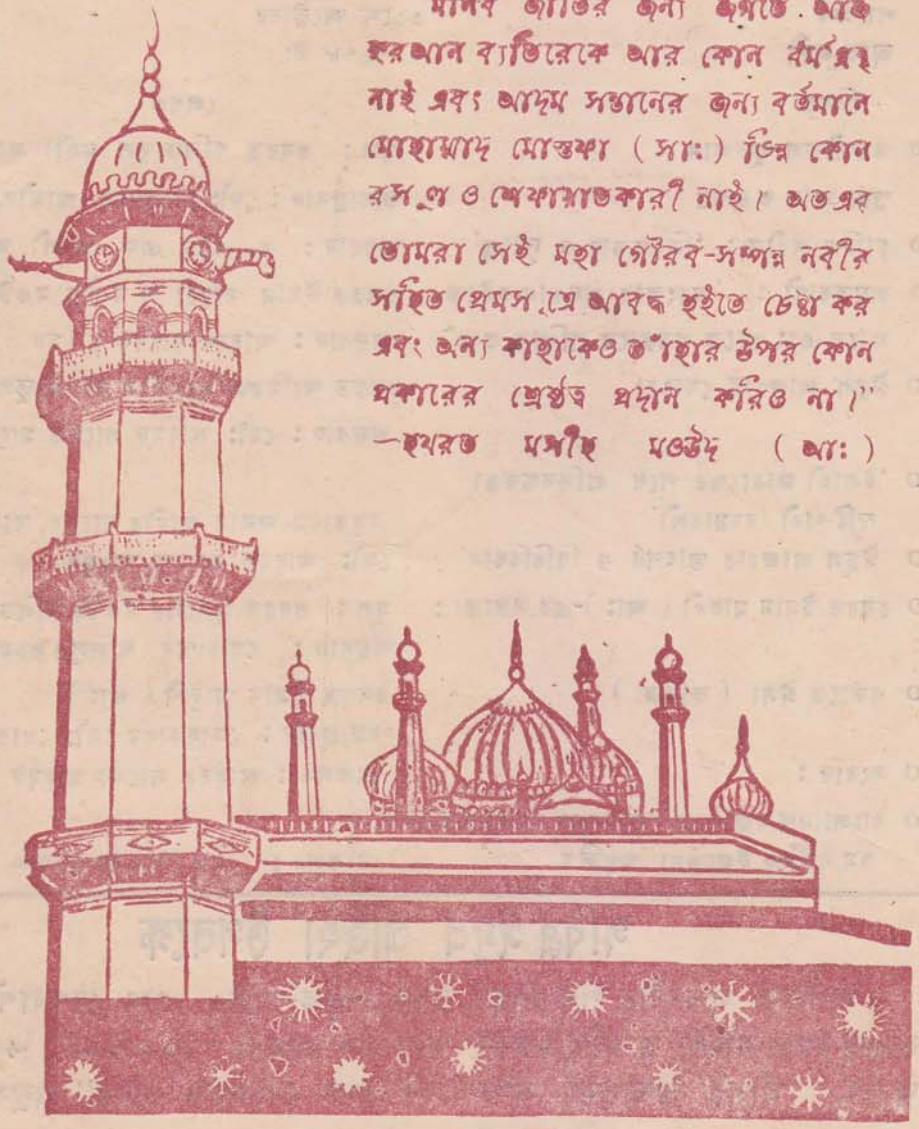

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং : ২৮শে জিলকদ, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্মদী	৩১শে অক্টোবর ১৯৭৮ ইং	৩৩শ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'অহংকার শয়তান হইতে আসে এবং তাকে শয়তানে পরিণত করে'	হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহমুদ	৭
০ ঈদুল আজহার খোৎবা	হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস অনুবাদ : মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ	৯
০ 'ইলাহী জামাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী'	মহ্তারম জনাব আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	১৭
০ 'ঈদুল আজহার তাৎপর্য ও বিধিবিধান'	মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ	১৭
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২১
০ ওফাতে ঈসা (কবিতা)	হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বঙ্গানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মদ	২৫
০ সংবাদ :	সংকলন : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ	২৬
০ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত	সংকলন : মোঃ মুজিবুর রহমান	২৮

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে

পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকা এবং দেশবাশীর খেদমতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম " اسن عید مبارک بادت " অর্থাৎ "ঈদের শুভাগমন আপনাদের জন্য মোবারক হউক" অনুযায়ী জানাই

"আন্তরিক ঈদ মোবারক"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে বিশেষ আবেদন এই যে, পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার চলতি বৎসরে ছয় মাস গত হইতে চলিয়াছে, অথচ আশানুরূপ চাঁদা আসিতেছে না। কাহারও কাহারও ২/৩ বৎসরের পর্যন্ত বকেয়া পড়িয়াছে। অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব চাঁদা অত্র অফিসে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, অন্যথায় আমরা চাঁদা অনাদায়কারীদের নামে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১২ম সংখ্যা

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং : ৩১শে এখা, ১৩৫৭ হিজরী শামসী :

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার সমর্থনে তৃতীয় প্রমাণ এই যে, আলোচ্য আয়াতে এক খুব বড় সদকা-দাতা এবং দান-বীরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কালামেও এমনি এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের সুসংবাদ দেওয়া আছে। উভয় বর্ণনা-উল্লিখিত ব্যক্তি এক জনই হইতে পারেন, কারণ উভয় বর্ণনায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষণাবলী ও আবির্ভাবের সময় একই। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন,

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله احد

অর্থাৎ "যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে তাঁহার কসম, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন, ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারীরূপে, তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন ও শুকর বধ করিবেন, জিজিয়া কর এবং ধন বিতরণ করিবেন, অথচ কেহ উহা গ্রহণ করিবে না।" এই হাদীস হইতে বুঝা যাইতেছে যে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার শেষ যুগের উম্মতের জন্য আগমনকারী মসীহ ইবনে মরিয়মের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ধন বিতরণ করিবেন। এই কথা এবং কওসার শব্দের মর্ম একই। ধনবিতরণকারী এবং অশেষ সদকা ও খয়রাতকারী একই ব্যক্তি নির্দেশ করিতেছে। যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে উক্ত মহাপুরুষকে মসীহ মওউদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং চিহ্নিত মহাপুরুষ এবং কওসার বর্ণিত মহাপুরুষকে আমরা এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই মিল ও সামঞ্জস্যকে গ্রহণ ব্যতিরেকে দ্বিবিধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয়ের সত্যতা সপ্রমাণ ও সাব্যস্ত করা সম্ভব নহে। যেহেতু আঁ-হযরত

ইলাহী জামাতে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী :

১। খেলাফত ও ও নেজামে খেলাফতের আনুগত্য ও এতায়াতের অভাব ও কমজোরী।
২। কুরআন মজীদ ও সেলসেলার কেতাবাদি বুঝিয়া না পড়া।
৩। বাজামাত নামাযে শৈথিল্য।
৪। জুমার নামাযের প্রতি ঔদাসীন্য।
৫। নিয়মানুসারে রোযা পালন না করা।
৬। চাঁদার বাজেট লিখাইতে আয় কম দেখানো এবং সহিভাবে চাঁদা না দেওয়া বা বকেয়াদার ও নাদেহেন্দ হওয়া।
৭। কেতনা করা।
৮। বুযুরগানদের সম্বন্ধে কুধারণা রাখা, ছিদ্রান্বেষণ করা এবং গীবত করা।
৯। দীনের খেদমত করিয়া প্রচারণা করা বা অহঙ্কার করা।
১০। আওলাদের সহি তরবীয়ত না করা।
১১। বিবাহ ব্যাপারে সেলসেলার আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন।
১২। রসুমাতের গোলামী করা।
১৩। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ।
১৪। আপোষের লেনদেন পরিস্কার না রাখা।
১৫। সেলসেলার জন্য সর্ব প্রকার কুরবানী করিতে অনীহা।
১৬। সেলসেলার উহুদাদার ও কর্মীগণের কর্তব্যে অবহেলা।
১৭। ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থ ও মতকে প্রাধান্য দেওয়া।
১৮। বেপরদা ও অবাধ মেলামেশা।
১৯। মরকজের সহিত ঘনিষ্ঠ ও মুহব্বতের সম্বন্ধ না রাখা।

উপরুক্ত ত্রুটিগুলির আনুপাতিক বর্তমানতা ব্যক্তি ও তাহার পরিবারকেও আনুপাতিক ভাবে আল্লাহতায়ালার ফযল ও রহমত হইতে বঞ্চিত করে। ফলে পরিবার সহ সে জামাত হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং তাহারা রূহানীয়ত হারাইয়া জামাতের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আল্লাহতায়ালা সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সর্ব প্রকার ত্রুটি হইতে আপন করুণায় রক্ষা করুন এবং তাহাদিগকে আপন ফযল ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন এবং জামাতকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবমান রাখুন। আমীন।

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

(সাঃ) কুরআনী ওহীর প্রাপক, বাহক ও ধারক ছিলেন, সুতরাং কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা করিবার অধিকার একমাত্র ও সর্বপ্রথম তাঁহারই ছিল। যখন তিনি শেষ যুগে মুসলমানগণের মধ্যে আবির্ভাবকারী মসীহ মওউদ (আঃ)-কে ধন বিতরণকারী হইবেন বলিয়াছেন, সুতরাং সুরা কওসার নির্দিষ্ট খুব বড় সদকাকারী ও দান বীরকে আমরা মোহাম্মদী মসীহ বলিতে বাধ্য।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে, ইহা কিরূপে হইতে পারে যে, একজন ধন দান করিবে অথচ লোকে উহা গ্রহণ করিবে না। কুরআন করীমে কওসার অর্থাৎ এক মহাদাতার ভবিষাদ্বাণী করা হইয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) সেই মহাপুরুষের পরিচয়কে আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছেন যে সেই মহাদাতা ধন বিতরণ করিবেন কিন্তু জন সাধারণ কেহ উহা কবুল করিবে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করার আশঙ্কা ছিল, তাই তাহাদিগকে ভ্রান্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে আঁ-হযরত (সাঃ) চিহ্নিত মহাপুরুষের পরিচয়কে প্রসারিত ব্যাখ্যার দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়া দিলেন, যাহাতে সুরা কওসার বর্ণিত মহাপুরুষকে মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়া চিনিতে ভুল না হয়। এখানে ধন বলিতে জড়-ধন নহে, বরং রুহানী ধনকে বুঝাইয়াছে। উপরুক্ত হাদিসে "জনগণ ধন কবুল করিবে না" কথাগুলি কওসার শব্দের স্বরূপ বলিয়া দিয়াছে। সাধারণ ভাবে মানুষ সোনা রূপা পাইলে লইতে অস্বীকার করে না। নবীগণ যে রুহানী সম্পদ আনেন উহাই মানুষ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ইসলামী পুস্তকাবলীতে রুহানী এলেম ও তত্ত্বজ্ঞানকে সম্পদ বলিয়াছে। নবীরাও রূপক ভাষায় তত্ত্বজ্ঞানকে ধন বলিয়া থাকেন। যথা, বাইবেলে আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট তাঁহার এক দুশমন আসিয়া বলিল, "রোমের বাদশাহ তাহার নিকট হইতে খাজনা তলব করিয়াছেন, সে ইহা দিবে কি দিবে না?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি চাহেন তাহা আমাকে দেখাও।" সেই ব্যক্তি রোমক মুদ্রা দেখাইল যাহার উপর রোমের কায়সারের মূর্তী অঙ্কিত ছিল। হযরত মসীহ (আঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, "ইহা তো তাঁহার মাল (অর্থাৎ মুদ্রার উপর যাহার মূর্তী আছে, ইহা তাঁহার মাল)। সুতরাং যাহা তাঁহার মাল, উহা তাঁহাকে দাও এবং যাহা খোদার মাল, উহা খোদাকে দাও।" এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মসীহ (আঃ) রুহানীয়ত এবং রুহানী এলেমকে অর্থ ও সম্পদের সহিত তুলনা দিতেন এবং রুহানীয়তের মাল (আল্লাহর বন্দেগী এবাদত আদি) তিনি নিজ কওমের নিকট তলব করিতেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণ রূপক কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহারা মনে করিত তিনি বুঝি স্বয়ং সরকারী ট্যাক্স আদায় করিতেছেন। এবং তিনি রাষ্ট্র বিরোধী। এই বিষয়ের তত্ব লইয়া তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার জন্য তাঁহার দুশমনগণ তাঁহার নিকট গেল এবং প্রশ্ন করিল, "আমরা

রোমক হুকমতকে খাজনা দিব, না আপনাকে দিব?" হযরত মসীহ (আঃ) তাহাদের দুষ্ট মতলব ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি মালের ব্যাখ্যা এইভাবে দিলেন যে, মুদ্রার উপর যখন সম্রাটের মূর্তী অঙ্কিত আছে, ইহা তাহার মাল, ইহা তাঁহাকে দাও। ইহাতে আমার হক নাই, আমি কিরূপে ইহা চাহিব? আমি সেই মাল চাই, যাহার উপর আসমানী হুকুমতের মোহর আছে অর্থাৎ আমি রূহানী কুরবানী এবং তত্ত্বজ্ঞানের দাবী করি।" এই আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, হযরত মসীহ (আঃ) সাধারণভাবে মাল ও মুদ্রা শব্দগুলি রূহানী অর্থে ব্যবহার করিতেন। অনুরূপভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) মসীহ নাসরীর মসিল (সদৃশ)-র সংবাদ দিতে একই রূপকের ব্যবহার করিয়াছেন। হযরত মসীহ নাসরী (আঃ) রূহানীয়তকে বুঝাইতে যে রূপকে ব্যবহার করিতেন, তিনিও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সম্বন্ধে একই রূপক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কুরআন করীমেও অপরাপর বস্তুর জন্যও খাজানা বা মাল শব্দের ব্যবহার হইয়াছে:

قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا -

অর্থাৎ—"বল, যদি তোমরা আমার রবের রহমতের অফুরন্ত খাজানা সমূহ লাভ করিতে, উহাদের খরচ হইয়া যাওয়ার ভয়ে নিশ্চয় তোমরা উহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে, কারণ মানুষ বড় কৃপণ। (বণি ইসরাইল ১১শ রুকু)।

এই আয়াতের পূর্বে ধর্ম, কালামে-ইলাহীর নযুল এবং পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং ধনরাশি বলিতে ধর্ম-তত্ত্ব, রূহানী বিষয় ও কালামে-ইলাহীকে বুঝাইবে। এইভাবে সুরা তুরে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :— ام عندهم خزائن ربك ام هم المصيطرون -

"তাহাদিগের নিকট কি তোমার রবের খাজানা সমূহ আছে অথবা তাহারা উহাদের তত্ত্বাবধায়ক। (সুরা তুর—২য় রুকু। অর্থাৎ রূহানী কামালাত ও পুরস্কার দান করা আল্লাহতায়ালার কাজ, তাহাদিগের নহে। এ সবের ভাণ্ডার আল্লাহতায়ালা স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছেন। তাহাদিগের অধিকারে ইহা ছাড়িয়া দেন নাই। সুতরাং কে এমন আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উচ্চ রূহানী মর্যাদা লাভের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারে? তাঁহার দুশমনগণ কি রূহানী খাজানা সমূহের অধিকারী যে, যাহাকে খুশী তাহারা উহা দান করিবে?

উপরের হাওয়ালাগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ঐশী পুস্তক এবং আম্বিয়া কুলের রূপক ভাষায় রূহানীয়ত এবং তত্ত্বজ্ঞানকে মাল বা খাজানা বলা হইয়াছে। বস্তুত এই সকলই প্রকৃত ধন। মসীহ নাসরী (আঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা যে রুটি খাও, উহা খাইয়া তোমরা জীবিত থাক না। বরং তোমরা কালামে ইলাহীর দ্বারা জীবিত থাক।" (মথি

৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক)। সুতরাং কাওসারের ভবিষ্যদ্বানী এবং মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ধন বিতরণের অর্থ এই যে, আগমনকারী মহাপুরুষ রুহানীয়ত ও মারফতের ভাণ্ডার লুটাইবেন কিন্তু প্রত্যেক নবীর যুগে যেরূপ ঘটিয়াছে, তাঁহার যুগেও, তাঁহার দেওয়া ধন লোকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে।

ইতিপূর্বে কাওসার শব্দের এক অর্থ خير الكثير বহু কল্যাণও করা হইয়াছে। خير কল্যাণ শব্দ ইসলাম এবং ধর্মের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এক ইলহাম আছে الخير كله في القران 'সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং মঙ্গল কুরআন করীমেই আছে'। অতএব যে ব্যক্তি কুরআনী তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করেন তিনি বস্তুতঃ অন্য কথায় خير কল্যাণ বিতরণ করেন। মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য এই কার্য নির্দিষ্ট আছে। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কুরআনী তত্ত্বজ্ঞান এত অধিক পরিমাণে বিতরণ করিয়াছেন যে, তাহার শেষ নাই। এই ধন অস্বীকার করা অজ্ঞগণের কাজ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মুসলমানগণও এই সম্পদকে প্রথম হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিয়াছে যাহারা এই ধন গ্রহণ করে নাই, তাহারা ইহার কি মর্ম বুঝিবে! হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা, যাহারা এই দৌলতকে কবুল করিয়াছি, আমরা ইহার মর্যাদা ও মূল্য জানি। ইহা অতুলনীয়, আমরা এই দৌলত হইতে এত কল্যাণ আহরণ করিয়াছি যে, আমাদের ঘর ভরিয়া গিয়াছে। যথা—আমি স্বয়ং ইহার দৃষ্টান্ত। দুনিয়ার শিক্ষার দিক দিয়া আমি প্রাইমারী ফেল। কিন্তু যেহেতু মাদ্রাসা নিজেদের ছিল. সেইজন্য প্রত্যেকবার পরীক্ষার পর আমাকে ক্লাশে উঠাইয়া দেওয়া হইত। পরিশেষে যখন মেট্রিক পরীক্ষার সময় আসিল তখন আমার সব পড়ার বহর খুলিয়া গেল। আমি কেবল আরবী এবং উর্দুতে পাশ হইলাম। অতঃপর লেখাপড়া ছাড়িয়া দিলাম। মোট কথা, আমার দুনিয়ার শিক্ষা কিছুই হয় নাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন একবারও হয় নাই যে, আমার সম্মুখে কুরআন করীমের বিরুদ্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার উত্তর শুনিয়া লজ্জিত না হইয়াছে। আজও আমার এই দাবী যে, যত বড় আলেম বা শিক্ষিত ব্যক্তি হউক না কেন, আমার নিকট কুরআন করীমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাহাকে অবশ্য পরাজিত হইতে হইবে এবং লজ্জিত ও নিরুত্তর হওয়া ছাড়া তাহার গত্যান্তর থাকিবে না। আমি ইউরোপ, মিশর এবং সিরিয়ায় গিয়াছি এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিদ্যার বিশারদগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু একবারও এরূপ ঘটে নাই যে, বিদ্যা ও ধর্মের আলোচনার ময়দানে আল্লাহতায়ালার ফযলে আমি জয়ী না হইয়াছি। এবং যখনই কাহারও সহিত আমার আলোচনা হইয়াছে, বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেককে আমার প্রাধান্য ও আমার প্রমাণের অকাট্যতাকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত

২৫৪। হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়া পাঠাইয়া-দিয়াছেন, উহার তুলনা সেই বৃষ্টিবৎ, যাহা ভূমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে, ফসল ভাল হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, যাহা পানি রোধ করে। তদ্বারা আল্লাহতায়ালা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাহাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আরো এক শ্রেণী আছে—চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করিতেও পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না। এই দৃষ্টান্তরূপ কোনো মানুষ এমন যে, ধর্ম বুঝিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে, তদ্বারা উপকৃত হয় এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্বয়ং শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়। চটান ভূমিরূপ ঐ ব্যক্তি যে হেদায়ত কি তাহা মাথা তুলিয়া দেখেও না, ইহা নিয়া কোনো চিন্তাও করে না এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যে ধর্ম-পথ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করে না।"

(মুসলিম, কেতাবুল ফাযায়েল, বাবু বায়ানেল মাসালে মা বুয়েসা বেহিন নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিনাল হুদা ওয়াল ইলম; ২—২ : ৫০ পৃ:)

২৫৫। হযরত আবু মূসা আশ্আরী রাযি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "ভাল সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর তুলনা ঐ দুই ব্যক্তিবৎ যাহাদের একজন কস্তুরী (মৃগনাভী) বহণ করিতেছে। অন্য ব্যক্তি হাপর চালক। কস্তুরী বাহক তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দিবে। তুমি হয়ত খরিদও করিবে। নতুবা অন্ততঃ উহার সৌরভ তুমি গ্রহণ করিবে। হাপরওয়ালা হয়ত তোমার জামা কাপড় পোড়াইবে, বা দুর্গন্ধযুক্ত ধোয়া তোমাকে বিব্রত করিবে।"

(মুসলিম কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে, বাবু ইস্তেজাবু মায়া জালেসতেস্ সালেহীন, ২—২ : ২০৪ পৃ:)

৩৮। প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক হইতে আরম্ভ করার নির্দেশ।

২৫৬। হযরত আবু হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

"যখন কোনো ব্যক্তি জুতা পরিবে, তখন ডান পায়ে প্রথম পরিবে এবং জুতা খোলার সময়ে বাম পা হইতে প্রথম খুলিবে, যাহাতে প্রথমে এবং শেষেও ডান দিকের প্রতি খেয়াল থাকে। (বুখারী, কেতাবুল আদব, ২ : ৮৮০ পৃ:)

৩৯। আগমন সম্বর্ধনা ও বিদায় সম্বর্ধনা

২১৭। হযরত সায়েব বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন : যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমণ করিলেন, তখন মদিনাবাসী সানিয়াতুল বেদায় পর্যন্ত তাঁহার (সাঃ) সম্বর্ধনার্থে পৌঁছিয়া ছিলেন।" সায়েব (রাযিঃ) বলেন যে, তিনিও লোকের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তখন তিনি অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন।

২৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন সফর হইতে প্রত্যাগমণ করিতেন, তখন গৃহবাসী শিশুগণ পর্যন্ত তাঁহার সম্বর্ধনার্থে যাইতেন। একদা যখন তিনি সফর হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সর্বাগ্রে আমাকে তাঁহার (সাঃ) নিকট পাঠান হইল। তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর, ফাতেমার (রাঃ) দুই পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হুসায়েনের (রাঃ) মধ্যে এক এক জনকে আনা হইল। তখন তিনি তাঁহাকেও তাঁহার পিছনে বসাইলেন। এইরূপে মদিনা মুনাউ-ওয়ারায় তিনি এমন শানের সহিত প্রবেশ করিলেন যে, এক উটে আমরা তিন আরোহী ছিলাম।" ['মুসনাদ আহমদ ১ : ২০২ পৃ]

২৫৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক জরুরী সামরিক ব্যাপারে প্রেরণ উদ্দেশ্যে সাহাবাগণকে (রাঃ) বিদায় সম্বর্ধনার্থে তাঁহাদের সঙ্গে 'বাকি-উল-গারকাদ' পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তাঁহাদের জন্য দোয়া করিলেন, আল্লাহতায়ালার নামের উপর, অর্থাৎ তাঁহার সন্তুষ্টি (রিযা) এবং তাঁহার দ্বীনের সেবায় যাওয়ার তৌফিক হউক। আল্লাহ আমার, ইহাদের সাহায্য কর। এই সামরিক কর্ম তৎপরতা কায়াব বিন আশরাফের ধৃষ্টতার প্রতীকারার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (মুসনাদ আহমদ, ১ : ২২৬ পৃ :)

৪০। সফর এবং তৎসম্পর্কিত নীতি।

২৬০। হযরত আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি নিবেদন করিল : 'হে রসুলুল্লাহ, আমাকে ভ্রমণ-পর্যটনের অনুমতি দিন। তিনি ফরমাইলেন : "আমার উম্মতের ভ্রমণ-পর্যটন, আল্লাহর পথে জিহাদ।"

('আবু দাউদ ; কেতাবুল জেহাদ, বাবু নাহা আনিস সিয়াহা ; ১ : ৩৩৬ পৃ:)

২৬১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল : 'আল্লাহর রসুল, আমি সফরে যাইতে চাই। আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন'। তিনি ফরমাইলেন : আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর (তাঁহাকে আশ্রয় কর)। যখনই উপরে উঠ, তকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলিবে। ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করিলে তিনি দোওয়া করিলেন "হে আল্লাহ, ইহার দূরত্ব সংকোচিত করিয়া দাও। অর্থাৎ তাহার সফর শীঘ্রই শেষ হউক। তাহার যাত্রা সহজ কর।" (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবার জন্য ঃ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"অহংকার শয়তান হইতে আসে এবং অহঙ্কারীকে শয়তানে পরিণত করে।"

"অহঙ্কার এমনই এক আপদ, যাহা মানুষের পিছা ছাড়ে না। মনে রাখিবে, অহংকার শয়তান হইতে আসে এবং অহংকারী ব্যক্তিকে শয়তানে পরিণত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ পথ হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়া না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কখনও হক কবুল বা সত্য গ্রহণ এবং এলাহী ফয়জ বা ঐশী কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। কেননা অহংকার তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া যায়। সুতরাং কোন প্রকারেই অহংকার করা উচিত নয়—না জ্ঞানের দিক দিয়া, না প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়া, না বর্ণ বংশ বা পারিবারিক নাম ধামকে কেন্দ্র করিয়া। কেননা অধিকতররূপে অহংকার উক্ত বিষয়াবলীর সূত্রেই সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজেকে এই সকল গর্ব ও দম্ভ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মহান আল্লাহতায়ালার নিকট পছন্দনীয় ও মনোনীত হইতে পারে না এবং সেই 'মারেফতে-এলাহী' (ঐশীতত্ত্বজ্ঞান) যাহা প্রবৃত্তির উত্তেজনা সমূহের মন্দ পদার্থকে ভস্মীভূত করে তাহা দান করা হয় না। কেননা আত্মিকা শয়তানের অংশ বিশেষ। উহা আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না। শয়তানও এই প্রকারেই অহংকার করিয়াছিল এবং নিজেকে আদম (আলাইহিস সালাম) হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল :

(আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি আগুন হইতে (অর্থাৎ অগ্নিস্বভাব করিয়া) সৃষ্টি

انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين

করিয়াছ এবং তাহাকে কার্দমা হইতে (অর্থাৎ নম্রস্বভাব বিশিষ্ট করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছ —অনুবাদক)। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহতায়ালার দরবার হইতে সে বিতাড়িত হয়"

(তাকরিরাইন, পৃঃ ১৯)

"অহংকার ও দুস্কৃতি (শরারত) বড়ই মন্দ ব্যাপার। সামান্য একটি বিষয়ের দ্বারাই সত্তর বৎসরের আমল ব্যর্থ হইয়া যায়। লিখিত আছে যে, এক আবেদ (সাধক) ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাহাড়ে থাকিতেন। বহুদিন যাবৎ সেখানে বৃষ্টি হইতে ছিল না। একদিন যখন বৃষ্টি হইল, তখন পাথর ও কঙ্করগুলির উপরও বর্ষিত হইল, উহাতে তাঁহার মনে সংশয় ও আপত্তি জন্মাইল যে, বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল ক্ষেতে ক্ষমারে ও বাগান সমূহে। এ কি ব্যাপার যে, উহা পাথরগুলির উপর বর্ষিল? এই বৃষ্টি যদি ক্ষেত-খামারে হইত, তাহা হইলে কত ভাল হইত! ইহাতে খোদাতায়ালা তাহার সকল সাধনা ও বেলায়ত কাড়িয়া লইলেন। অবশেষে তিনি অত্যন্ত দুঃখীত হইলেন এবং অন্য এক বুজুর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন পরিশেষে তাঁহার নিকট পয়গাম আসিল যে, তুমি আপত্তি কেন করিয়াছিলে? তোমার ঐ ভ্রমের জন্যই শাস্তি হইয়াছে।"

(মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫০)

"অহংকার বিবিধ প্রকারের। কখনও ইহা চক্ষুর দ্বারা প্রকাশ পায়। যখন অন্যের প্রতি সে চোখ রাঙাইয়া তাকায় তখন উহার অর্থ এই হয় যে সে অন্যকে তুচ্ছ মনে করে এবং নিজেকে বড় মনে করে। কখনও উহা জবান বা মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়। আর কখনও উহার প্রকাশ মাথা দ্বারা হইয়া থাকে এবং কখনও হাত এবং পায়ের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। মোট কথা, অহংকারের বহুবিধ উৎস রহিয়াছে। মোমেনের উচিত, সেই যাবতীয় উৎস হইতে আত্মরক্ষা করা এবং তাহার কোনও অংগ-প্রত্যঙ্গ যেন এরূপ না হয়, যদ্বারা অহংকারের গন্ধ পাওয়া যায় এবং সে অহংকার প্রদর্শনকারী হয়। সুফীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে নীচশ্রেণীর আখলাক বা প্রবৃত্তির বহু জিন রহিয়াছে এবং যখন সেগুলি বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন একটির পর আর একটি নির্গত হইতে থাকে। কিন্তু সর্বশেষটি হইয়া থাকে অহংকারের জিন এবং খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ এবং মানুষের সত্যকার মুজাহেদা (সাধনা) ও দোওয়ার দ্বারাই উহা বহিষ্কৃত হয়

বহু লোক আছে যাহারা নিজেকে বিনয়ী ও নিরহংকার মনে করে কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কোন না কোনও প্রকারের অহংকার (গুপ্ত) থাকে। সেইজন্য অহংকারের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম প্রকার সমূহ হইতেও আত্মরক্ষা করা উচিত।

কোন সময় এই অহংকার ধনপ্রসূত হইয়া থাকে। বিত্তশালী অহংকারী অন্যকে কাংগাল মনে করে এবং বলে যে, 'সে কোন্ ব্যক্তি যে আমার মোকাবিলা করিতে পারে?' কোন কোন সময় খান্দান ও জাতের অহংকার হইয়া থাকে। সে মনে করে তাহার জাত বা বংশ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং অপর ব্যক্তি ছোটজাতের।... ... .কোন সময় অহংকার এলম বা জ্ঞান হইতে আসিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভুল শব্দ বলিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ ধরিয়া বসে এবং চেঁচাইয়া বলে যে, এই ব্যক্তি তো একটি শব্দও সঠিক বলিতে জানে না। মোট কথা, অহংকারের বিভিন্ন শ্রেণী-প্রকার আছে। এই সবই মানুষকে নেকী ও পূণ্যলাভে বঞ্চিত করে এবং জনগণের উপকার করিতে বাধা দেয়। এই সকল হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষা এক প্রকারের মৃত্যুকে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মৃত্যুকে বরণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার বরকত ও কল্যাণ মানুষ তাহার উপর নাজেল হইতে পারে না এবং খোদাতায়ালা তাহার তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক হইতে পারেন না।"

(মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ৪০০-৪০৩)

"আমি আমার জামাতকে নসিহত করিতেছি যে, অহংকার হইতে বাঁচ। কেননা, অহংকার আমাদের যুলজালাল, মহামহিমান খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণ্য। কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝিবে না, অহংকার কি? সুতরাং আমার নিকট বুঝিয়া লও। কেননা আমি খোদাতায়ালার রুহের সাহায্যে কথা বলি। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তাহার ভ্রাতাকে হেয় বা তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং মনে করে যে সে তাহার চাইতে অধিক জ্ঞানী বা অধিক বুদ্ধিমান অথবা অধিক কৌশলী, সে অহংকারী। কেননা সে খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস বলিয়া মনে করে না; এবং নিজেকে কোনকিছু বলিয়া সাব্যস্ত করে। খোদাতায়ালা কি কাদের

বা সক্ষম নন যে তাহাকে উন্মাদ করিয়া দেন এবং তাহার ভ্রাতা যাহাকে সে হেয় মনে করে, তাহাকে তাহার চাইতে অধিক জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা দান করেন। তেমনি সেই ব্যক্তি যে তাহার কোন ধন-সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা ভবিয়া তাহার ভ্রাতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সেও অহংকারী, কেননা সে ভুলিয়া গিয়াছে যে এই ধন ও প্রতাপ খোদাতায়ালাই তাহাকে দান করিয়াছেন। সে অন্ধ এবং জানে না যে, সেই খোদা তাহার উপর এমন বিপদ চক্র ঘুরাইতে সক্ষম যাহার ফলে সে সাহসা 'আসফালুস সাফেলীনে' (অবনতির চরম গহ্বরে) পতিত হয় এবং তাহার ভ্রাতা, যাহাকে সে হেয় মনে করে তাহাকে তাহার চাইতে উত্তম মাল ও দৌলত দান করেন। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর গর্ব করে কিম্বা নিজের (কায়িক) সৌন্দর্য ও শক্তির উপর গর্বিত, এবং বিদ্রূপ করিয়া তাহার ভ্রাতার ঘৃণাসূচক নাম রাখে এবং তাহার দৈহিক দোষ ত্রুটি মানুষকে শুনায়, সেও অহংকারী এবং সে সেই খোদার সম্বন্ধে অজ্ঞ যিনি এক নিমিষে তাহার মধ্যে এরূপ দৈহিক দোষ ত্রুটি সৃষ্টি করিয়া দিতে সক্ষম যাহার ফলে সে তাহার ভ্রাতা চাইতেও নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে, এবং যাহাকে তুচ্ছ তচ্ছিল্য করা হইয়াছে খোদা এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহার দৈহিক বলে বরকত দান করেন—যেন উহা কমও না হয় এবং লোপ না পায়। কেননা তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি তাহার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া দোওয়া করিতে শিথিল, সেও অহংকারী। কেননা সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস ও কেন্দ্রস্থলকে সে সনাক্ত করে নাই এবং নিজেকে সে কোনকিছু বলিয়া মনে করে। সুতরাং হে আমার প্রিয়গণ! তোমরা এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে। এমন যেন না হয় যে তোমরা কোন প্রকারে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে অহংকারী বলিয়া সাব্যস্ত হও, এবং সে সম্বন্ধে তোমরা বুঝিতেও অক্ষম থাক। কোন ব্যক্তি, যে তাহার ভ্রাতার মুখ দিয়া নিঃসৃত ভুল শব্দ অহংকারের সহিত সংশোধন করে, সেও অহংকারের অংশীদার হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের কথা বিনয়ের সহিত শ্রবণ করিতে চায় না এবং মুখ ফিরাইয়া লয়, সেও অহংকার হইতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কোন গরীব ভাই তাহার কাছে আসিয়া বসিলে তাহাকে যে ঘৃণা করে সেও অহংকারের ভাগী হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি খোদার মা'মুর ও আদিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত ব্যক্তির পূর্ণরূপে অনুবর্তিতা ও এতায়াত করিতে চায় না, সেও অহংকারের অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি খোদার মামুর ও প্রেরিত ব্যক্তির কথা সমূহ মনোযোগ সহকারে শুনে না এবং তাঁহার লিখাসমূহ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে না, সেও অহংকারে অংশীদার হইয়াছে। সুতরাং চেষ্টা কর, যেন অহংকারের কোনও অংশ তোমাদের মধ্যে না থাকে, যাহাতে ধ্বংস না হইয়া যাও এবং যাহাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি সহ নাজাত লাভ করিতে পার। খোদাতায়ালার দিকে ঝুঁক (প্রণত হও) এবং এ দুনিয়ায় কাহারও সহিত যতটুকু মহব্বত করা সম্ভব, ততটুকু তাঁহর সহিত মহব্বত কর, এবং এ দুনিয়ায় কাহাকেও যতটুকু ভয় করা সম্ভব ততটুকু তোমরা তোমাদের খোদাকে ভয় কর। পাক-দেল (পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট) হইয়া যাও। পাক-এরাদা, নিরহংকার ও বিনয়ী, নির্দোষ এবং দুষ্কৃতি-মুক্ত হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়।" (নযুলুল মসীহ, পৃঃ ২৪—২৫)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল আজহার খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়া)

জগতে ইহাই একমাত্র বুনিয়াদি সত্য যে, ইসলাম সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করিবে।

এই বাস্তব সত্য আহমদীয়তের সন্তানগণের নিকট সেই কুরবানীর দাবী ও তাকীদ জানায় যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ -এর পুত্র ও বংশধরগণ আল্লাহর সমীপে পেশ করিয়াছিলেন।

সেই কুরবানী পেশ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত হইয়া যাও, যাহাতে তোমরা আল্লাহতায়ালার রহমত ও কল্যাণরাজির ওয়ারিশ হইতে পার।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

وفديناه بذبح عظيم و تركنا عليه فى الاخرين - (صفات : ١٠٨-١٠٩)
و اذ قال له ربه اسلم - قال اسلمت لرب العلمين و وصى بها ابرهيم
بنيه و يعقوب - يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا
و انتم مسلمون

অতঃপর বলেন :

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের জন্য এ ঈদ এই রঙে মুবারক করুন যে, এই ঈদের সহিত যে সকল কুরবাণী ও আত্মত্যাগের সম্বন্ধ এবং উহাদের ফলশ্রুতিতে কুরবে-এলাহী (ঐশী নৈকট্য) প্রাপ্তির যে সকল পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহা যেন আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য খুলিয়া দেন এবং স্বীয় রহমত ও কল্যাণ-রাজির দ্বারা আমাদিগকে অভিষিক্ত করেন।

হযরত ইব্রাহীম আলাহেস সালাম এক রো'ইয়া (স্বপ্ন) দেখেন এবং তদনুযায়ী উহা বাহ্যতঃ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবেহ্ করার জন্য তৎপর হন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিলেন যে, তোমাকে স্বপ্নে যে আদেশ দান করা হইয়াছে, তাহা সন্তানকে বাহ্যিকভাবে হত্যা করা বা তাহার আত্মহত্যা নয় বরং উহা স্বীয় নফ্স এবং সন্তানের মহান কুরবানীর নির্দেশ বহণ করে। মৃত্যুর বিভিন্ন রূপ ও আকার আছে। যেমন, মানুষ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায় অথবা কোন ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে জীবন-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যে মৃত্যু শাহাদত রূপে আসে কিংবা যে মহান কুরবানী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট চাওয়া হইয়াছিল, উহার মোকাবেলায় অপরাপর মৃত্যু কোনই

মর্যাদা বা মূল্য রাখে না। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক মৃত্যুই এক সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ব্যাপার হইয়া থাকে। কিন্তু উহা ছিল আজীবন এক সার্বক্ষণিক মহান কুরবানীর ব্যাপার, যাহা মানুষের আত্মা ও বিবেক এবং আবেগে এক আলোড়ন ও জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন যে আমরা এক স্বর্গীয় উপরণ স্বরূপ 'যিব্‌হে আযীম' বা সুমহান কুরবানীকে নির্ধারণ করিয়াছি। ইহা একদিকে যেমন যিব্‌হে আযীম, অন্যদিকে নাজাতেরও কারণ; ইহা মৃত্যুও বটে, আবার জীবনেরও উৎস। সেজন্য وتركنا عليه في الآخرين —আমরা এই রীতিকে পরবর্তী জাতিসমূহেও পরিচালিত করিয়াছি, এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে উহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে এবং উহা চরম শিখরে উপনীত হইয়াছে।

এই 'যিব্‌হে আযীম" সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা অন্যত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গেই নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—اذ قال له ربه اسلم অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইহা বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐশী নির্দেশটির অর্থ সন্তানকে জবেহ্ করা নয়, বরং উহার দ্বারা যিবহে আযীম বা এক সুমহান কুরবানী ও আত্মত্যাগ বুঝান হইয়াছে এবং 'আসলেম (আত্মসমর্পন)-এর দাবী জানান হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন যে, اسلمت لرب العلمين অর্থাৎ তাঁহার বাক, বুদ্ধি, হৃদয়, আবেগ, চিন্তা, ভাবনা এবং তাঁহার আত্মা হইতে এই ধ্বনিই উঠিয়াছিল যে, 'আমি তো পূর্ব হইতেই সমস্ত জাহানের স্রষ্টা ও পালন-কর্তার নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছি এবং তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার জুয়াল কাঁধে লইয়াছি। মোট কথা, যে মহান আল্লাহ্ এ বিশ্বজগৎ তাঁহার নির্ধারিত উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই রাববুল আলামীনের সমীপেই আমি আমার 'ইসলাম' (আনুগত্য ও আত্মসমর্পন) পেশ করিতেছি।'

সুতরাং তাঁহার (ইব্রাহীম) নিকট যেহেতু সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা ধারাবাহিক শৃঙ্খলরূপে এমন এক তাহরিক বা আহ্বান ও আন্দোলন, যাহা এই উদ্দেশ্যে জারী করা হইয়াছে যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দ্বারা আনিত জ্যোতিকে জগৎব্যাপী ছড়াইয়া দেওয়া হইবে, সেইহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় সন্তানকে, তারপর তাঁহার বুজর্গ সন্তানরাও তাহাদের সন্তান দগকে এই উপদেশ ও তাকীদ করিতে থাকেন যে, দেখ, এক দ্বীন ও শরীয়ত তোমাদের জন্য মনোনীত করা হইল (ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সন্তানদের সময়কালের দিক দিয়াও এবং তাঁহার পরিবার ও বংশধরের মধ্যেই যেহেতু হযরত খাতমাল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর জন্ম ও আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, সেই দৃষ্টি-কোণ হইতেও) সুতরাং তোমরা তোমাদের জীবনের একমুহূর্তও এমন অবস্থায় অতিবাহিত করিবে না যখন তোমাদের উপর 'এক মৃত্যু ঘটিতে না থাকে

সুতরাং কুরআন করীম ও হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র হাদিসে এবং মসীহ মওউদ (আঃ)-কতৃক বর্ণিত কুরআনের তফসীরে ইসলামের যে রুহ বা মর্ম কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই যে, একটি খাসি বা গরু যেমন উহার গলা কসাইয়ের ছুরির নীচে পাতিয়া দেয়, তেমনি মানুষ যেন তাহার সম্পূর্ণ স্বত্তাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও নির্দেশাবলীর কল্যাণকর ছুরির নীচে স্থাপন করে। মোট কথা, ইসলামের অর্থ নিজের বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে সার্বিকরূপে গ্রহণ করা এবং (প্রেম ও আনুগত্য দ্বারা) খোদাতায়ালার স্বত্তায় বিলিন হইয়া নিজের উপর 'ফানা' (আত্মবিলোপ) -এর অবস্থার অবতারণা করিয়া এক বিশেষ ধরণের মৃত্যুবরণ করা। এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে আমরা ইহা রূপকভাবেও বলিতে পারি যে, নিজেদের ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা হইতে বিবস্ত্র হইয়া খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির 'এহ্‌রাম' পরিধান করা এবং 'ফানাফিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌তে আত্ম বিলিনতা)-এর বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা, এবং খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাঁহারই প্রীতি ও সন্তোষ লাভের জন্য এক মৃত্যুকে—যাহা প্রতিমুহুর্তের এক সার্বক্ষণিক মৃত্যু—বরণ করা, যাহা (প্রকৃতপক্ষে) এরূপ এক জীবন, যাহার উপর আর কখনও মৃত্যু আসে না, সেই জীবনকে আল্লাহতায়ালার ফজল ও কৃপায় লাভ করা। ইহাই হইল ইসলামের মুলতত্ব বা হকীকত, যাহার উপর কুরআন করীম বিভিন্ন ধারায় ও পদ্ধতিতে আলোকপাত করিয়াছে।

সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাঁহার সন্তান ও বংশধরের মাধ্যমে কুরবানীর এই রীতি ও আদর্শ কায়েম করা হইয়াছে এবং ইহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। সমস্ত প্রাণীই তাহার জন্য উৎসর্গ হইবে—যেমন, হজ্জের সময়ে সহস্র বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যক পশু এই মহান কুরবানী বা আত্মত্যাগের স্মৃতি-চরণ হিসাবে প্রতি বৎসরই কুরবানী হইতেছে। ইহাতে মানুষকে এই সবক বা শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু ও সকল প্রাণীই মানুষের উদ্দেশ্যে কুরবাণী হইবে কিন্তু মানুষ খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্য এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ এক জীবন অবলম্বন করিবে, যাহার মধ্যে প্রতিমুহুর্তেই সে নিজের উপরে এক মৃত্যু আনয়ন করিবে। সে তাহার নফস-কে বিলিন করিবে, তবেই খোদাতায়ালার তরফ হইতে এক নতুন 'নফস' (বা আত্মা) তাহাকে দান করা হইবে, যাহার মধ্য হইতে সদা رضيت بالله ربا ('রাজিতুবিল্লাহে রাব্বান')—ধ্বনী নিঃসৃত হইতে থাকিবে। তাহার নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না—না তাহার নিজস্ব ইচ্ছা ও বসনা-কামনা, না তাহার কোন নিজস্ব কথা, না চোখ, না কান; সে খোদাতায়ালার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিবে, তাঁহার চক্ষের দ্বারা দর্শন করিবে, তাঁহার জবান দ্বারা কথা বলিবে। ইহা এ অর্থে নয় যে, খোদাতায়ালা তাঁহার স্বত্তায় বাহ্যতঃ অবর্তণ বা ভৌতিকভাবে রূপান্তরিত হইবেন, বরং ইহা এই অর্থে যে খোদার বান্দা স্বীয় নফস্ বা প্রবৃত্তির প্রতিটি বাসনা-কামনাকে, প্রতিটি উত্তেজনাকে এবং উহার সকল প্রকার শক্তি, ক্ষমতা ও

যোগ্যতাকে তাহার রবের জন্য কুরবান করিবে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে এক নব জীবন দান করিবেন। সেই নব জীবনে অভিষিক্ত হইয়া তাহার দ্বারা যে সকল কার্য সম্পাদিত হইবে এবং যে সকল শক্তির অভিব্যক্তি ঘটিবে সে সম্বন্ধে আমরা অলঙ্কারিক বা রূপকের ভাষায় ইহা বলিতে পারি যে, মানুষ খোদাতায়ালার চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াছে, খোদাতায়ালার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়াছে, খোদাতায়ালার ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অনুধাবন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং খোদাতায়ালার মুখ দিয়া তাহার ভাষণ নিঃসৃত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব কোনকিছুই নাই, সব কিছুই সে খোদাতায়ালার নিকট সমর্পন করিয়াছে। মানুষের এক মৃত্যু তো সাময়িকভাবে আসে, যাহা এক মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়: কিন্তু এক মৃত্যু এরূপ আছে, যাহা মানুষের সমগ্র জীবনকে স্বীয় বেষ্টনীতে ধারণ করে। ইহাই সেই মৃত্যু, যাহার উৎস হইতে অনন্ত জীবনের ধারা উৎসারিত হয়।

এই সেই 'যবহে আযিম,' যাহার দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সন্তান গণের দ্বারা কায়েম করা হইয়াছে। অতঃপর যখন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কালে এশকে-এলাহী আত্মোসর্গ ও আত্মত্যাগের চরম শিখরে উপনীত হইল, তখন এরূপ এক জাতি প্রস্তুত হইল, যাহারা হযরত ইসমাইল (আঃ) চাইতেও প্রবল আত্মোৎর্গ ও কুরবানীর মনবল ও উদ্দীপনার অধিকারী ছিলেন, যাঁহারা আল্লাহর প্রতি অধিকতর এশ্‌ক ও মহব্বত পোষণকারী ছিলেন। কেননা হযরত ইসমায়ীল আলাইহিস্ সালাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নিকট হইতে তরবিয়ত লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সাহাবা কেরাম (রাঃ) তো স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট হইতে তরবিয়ত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব রুহানীপর্যায়ে মৃত ছিলেন। দুনিয়ার দৃষ্টিও তাহাগিকে মৃত বলিয়াই জ্ঞান করিত, কিন্তু খোদাতায়ালার কুদরত ও মহিমা তাহাদিগকে জীবিত করিয়া তুলিল। তাঁহরা জগতে এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎকালীন সীমিত পৃথিবীতে ইসলামকে পরিপুর্ণ রূপে জয়যুক্ত করিলেন। সীমিত পৃথিবী বলিতে তৎকালীন পরিচিত পৃথিবী বুঝায়। কেননা সেইকালে পৃথিবী মানবজাতির দ্বারা পুর্ণ আবাদ পৃথিবী ছিল না। পৃথিবীর এমনও অনেক অঞ্চল ছিল যাহা মানুষের জ্ঞানগোচর হয় নাই। সেখানে তখনও আবাদী স্থাপন হয় নাই। পরবর্তীকালে আবাদী হইয়াছে। মোটকথা, সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিজেদের জামানায় ইসলামী বিপ্লব সাধিত করেন। তারপর পুর্বঘোষিত ঐশী ভবিতব্য অনুযায়ী মুসলমানদের উপর এক অধঃপতনের যুগ আসে। উহা এক দীর্ঘ যুগ, যে যুগে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর লক্ষ লক্ষ প্রেমিক অনুসারীবৃন্দ এই দোওয়ায় ব্যাপৃত থাকেন যে, শয়তানের উপর যে চরম বিজয়ের ওয়াদা ইসলামে দেওয়া হইয়াছে সেই চূড়ান্ত বিজয়ের শুভ দিন শীঘ্র

আসুক। তখন প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস সালামের আবির্ভাব ঘটিল। অর্থাৎ সেই মাহদী (আঃ) যিনি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সালামতির দোওয়াসমূহে সংরক্ষিত, সেই মোবারক স্বত্তা যাঁহার নিকট তাঁহার (সাঃ) সালাম পৌঁছিয়াছে। (যেমন, তিনি মাহদী (আঃ)কে তাঁহার সালাম পৌঁছাইতে বলিয়াছিলেন)। তেমনি বান্দাগণও তাঁহাকে সালাম পৌঁছাইয়াছেন। খোদাতায়ালার ফেরেস্তাগণ সালাম পৌঁছায়াইছেন, বরং এলাহী তকদীরও সালাম পৌছাইয়াছে।

সুতরাং উক্ত সলামতির দোওয়ারই বরকত ও কল্যাণ এই যে, আজ যখন আমরা সমগ্র মানবজাতির উপর দৃষ্টিপাত করি তখন একটিই মাত্র বাস্তব সত্য পরিদৃষ্ট হয়। আজ জগতে মানবজীবনে একমাত্র যে কঠোর সত্যটি বিদ্যমান, তাহা হইল এই যে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করিয়া 'উম্মতে ওয়াহেদা'—একই মণ্ডলীতে পর্যবসিত করা হইবে। সমস্ত মানবমণ্ডলী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মুষ্টির মধ্যে এবং তাঁহারই পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। ইহা এক বাস্তব ও অনড়-অটল সত্য। ইহা ছাড়া যাহা কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা মৌলিক সত্য নয়। সবই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়। উহাদের অস্তিত্ব যদিও আজ বিদ্যমান তথাপি কাল বিলিন হইয়া যাইবে। কিন্তু ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভ এক বাস্তব ও বুনিয়াদী সত্য। ইহার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটিবে এবং অব্যাহত থাকিবে। ইহা এক আলোকোজ্জল সত্য, যাহার আভা ও উজ্জলতায় গোটা পৃথিবী জ্যোতিঃ-ঝলমল হইয়া উঠিবে। দুনিয়া جاء الحق و زهق الباطل (—সত্যের জয়, মিথ্যার লয়) এর প্রতিচ্ছবি হইয়া দেখা দিবে। শয়তান পরাজয় বরণ করিবে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আনিত সত্য আধিপত্য বিস্তার করিবে। ইহা এক বুনিয়াদী সত্য; আসমান সমূহে আল্লাহ আল্লাহতায়ালার ইহাই ফয়সালা। ইহা বাস্তবায়িত হইবেই। আল্লাহ-তায়ালা এই মহা সত্যের বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে যে ঐশী আন্দোলনের সুত্রপাত করিয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া বিফলমনোরথ হইতে পারে?! ইসলাম আলবৎ জয়যুক্ত হইবে। দুনিয়ার সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হইবে; ইসলামের রুহানী অস্ত্র বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিবে। দুনিয়ার রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু ইসলামের রাজত্ব কখনও লয়প্রাপ্ত হইবে না।

এই রুহানী রাজত্বের জন্য যে বিনীত বান্দাগণকে মনোনীত ও প্রস্তুত করা হইয়াছে আপনারা হইলেন সেই সকল আজেয় বান্দা। এই মহান উদ্দেশ্যের মোকাবেলায় আমার এবং আপনাদের কোনই যোগ্যতা বা ক্ষমতা নাই। যদি আমাদের অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করা হয়, চূর্ণ বিচূর্ণও করা হয় ও আমাদের নিজেদেরই রক্তে উহার কাদা তৈরী হয় এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দুর্গকে মজবুত করার জন্য ও উহার দেয়ালগুলিকে উঁচু ও প্রশস্ত করার জন্য সেই কর্দম সেখানে ব্যবহার করা হয়, তাহা

হইলে ইহা আমাদের জন্য মহা গৌরবের বিষয় হইবে। কিন্তু দুনিয়া যদি মনে করে যে দুনিয়ার ধনদৌলত, দুনিয়ার মান-সম্মান, দুনিয়ার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং দুনিয়ার অস্ত্র-সস্ত্রের দ্বারা আল্লাহতায়ালার এই তকদীরকে বিচ্যুত বা বিলুপ্ত অথবা দুর্বল করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা তাহার ভুল ধারণা। এরূপ হইতে পারে না, কখনও হইবে না। কেননা খোদাতায়ালা যিনি কাদের ও তওয়ানা—সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী খোদা, যিনি সকল ক্ষমতার মালিক খোদা এবং যিনি তাঁহার ফয়সালার উপর প্রবল ও আধিপত্যের অধিকারী খোদা, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন; তাঁহারই এই অটল ফয়সালা যে ইসলাম সমগ্র দুনিয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে, জয়যুক্ত হইবে, এবং এই বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তার আহমদীয়াতের দ্বারাই নির্ধারিত। সুতরাং আজ দুনিয়ায় একমাত্র বাস্তবতা, এবং একটি মাত্র বুনিয়াদী সত্য বিদ্যমান তাহা হইল, ইসলাম সারা বিশ্বে আধিপত্য লাভ করিবে।

অল্লহতায়ালার ইহাই ফয়সালা যে সকল মানুষকে একই পতাকার নীচে সমবেত করা হইবে। সেই পতাকা হইল হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পতাকা। সমগ্র মানবজাতিকে, তাহারা দুনিয়ার যে কোন দূরদূরান্ত অংশেই বাস করুক না কেন, একমাত্র হস্ত ও মুষ্টির মধ্যে একত্রিত করা হইবে। সেই হস্ত ও মুষ্টি হইল হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর হস্ত ও মুষ্টি, যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে উহা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হস্ত নহে, উহা আমার হস্ত। খোদাতায়ালার এই হস্তের প্রভাব, পবিত্রশক্তি ও পরাক্রম বর্তমানেও ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হইবে যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বুনিয়াদী সত্য এবং শুভ সংবাদ আমরা যাহারা আহমদীয়াতের দিকে আরোপিত হই, আমাদের নিকট কুরবানী চায়। সেই কুরবানী, যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্রগণ এবং বংশধরগণ খোদাতায়ালার সমীপে পেশ করিয়াছিলেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রুহানী পুত্র ও সন্তানগণের নিকটও সেই কুরবানীরই তাকিদ ও দাবী জানায়। এই কুরবানীর জন্য আপনরা প্রস্তুত হউন, যাহাতে আমরা আল্লাহতায়ালার রহমত ও কল্যাণরাজীর ওয়ারিশ হইতে পারি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে প্রকৃত কুরবানী পেশ করার তওফিক দিন।

খোৎবা সানিয়ার পর হুজুর আকদাস (আঃ) আরও বলেন:

এখন আমি দোওয়া করিতেছি। ভ্রাতা-ভগ্নিগণ দোওয়ায় সামিল হউন: আল্লাহতায়ালা তাঁহার ফজলে আমাকে এবং আপনদিগকেও ঈদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করার এবং ঈদের বরকত ও কল্যাণসমূহ লাভ করার তওফিক দিন। আমিন।

[সাপ্তাহিক বদর, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ইং]

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ,
(সদর মুরুব্বী)

সম্পাদকীয় ঃ

ঈদুল আযহা

উহার তাৎপর্য ও বিধি-বিধান

মানুষ স্বভাবতঃ আনন্দপ্রবণ। তাই প্রত্যেক জাতিতে বিভিন্ন উপলক্ষে নির্দিষ্ট দিনে আনন্দ উৎসব করা হয়। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের জন্য দুইটি কল্যাণময় উপলক্ষে, আনন্দের দুইটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করেছেন—একটি ঈদুল ফিৎর, দ্বিতীয়টি ঈদুল আযহা। ঈদুল ফিৎর তো পবিত্র রমযানের পর মুমেনদের জন্য আনন্দ বার্তা বয়ে আনে, সারা মাস বিশেষভাবে আল্লাহতায়ালার আদেশাবলী পালনে তাদের কৃতজ্ঞ ও আনন্দমুখর করে তোলে। কিন্তু ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ যিল-হজ্জ মাসের দশম তারিখে হজ্জের এবাদত পালনের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল আঃ) ও হযরত হাজেরা (আঃ)-এর সম্মিলিত মহান আত্মত্যাগ ও কুরবানীর স্মৃতি-চারণ হিসাবে পশু কুরবানীর মাধ্যমে উদযাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে হজ্জ এবং ঈদুল আজহা সেই অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তমূলক ইব্রাহীমী কুরবানীর স্মৃতিকে উজ্জীবিত রাখার এবং মুমেনদের জীবনে উহার বাস্তব অনুশীলন করার উদ্দেশেই নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ-তায়ালার পথে কুরবানী ও আত্মত্যাগে সত্যিকার খোদাভক্ত ব্যক্তিরা যে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন এবং মানুষের কল্যাণের কারণ হন, অন্য কোনও পার্থিব বিষয়ে সে আনন্দ ও কল্যাণের নজির পাওয়া যায় না।

অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ -এর ঈদুল আযহার সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক খোৎবায় ঈদ উপলক্ষে কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য ও মহান উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে উহা উপলব্ধি করার এবং সত্যিকারভাবে নিজেদের জীবনে অনুশীলন করার তওফিক দিন। তাহ'লেই আমরা ঈদুল আজহার প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারব এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে উহার অত্যাবশ্যকীয় কল্যাণ রাজী প্রতিফলিত হবে।

নিয়মাবলী ঃ

শরীয়তের প্রত্যেক হুকুম কতকগুলি জরুরী মসলা বা নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মাধ্যমে পালিত হয়। সুতরাং ঈদুল আজহা সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত জরুরী বিধি-বিধান নিম্নে দেওয়া গেল, যাহা উক্ত ঈদ উদ্‌যাপনের সময়ে পালন করা আবশ্যকীয়।

জুমার নামাযের জন্য যেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় তেমনি ঈদের নামাযের জন্য তাহার চাইতেও অধিক গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। সেদিন মানুষের প্রফুল্লচিত্ত ও সহাস্য বদন থাকা আবশ্যকীয়। সামর্থ অনুযায়ী উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। একে অন্যকে উপহার

দেওয়া, নেমন্ত্রণ করা বিশেষতঃ গরীব মিস্কিনদের খাওয়ান এবং ঈদের আনন্দে তাদের শরীক করা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সুন্নত। ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা পর্যন্ত কিছু না খাওয়াই শ্রেয়। হযরত রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর এ-ই নিয়ম ছিল। ঈদের নামাজে যাওয়ার সময় ও ঈদগাহে নামাযের পূর্বে ও পরে এবং ফিরার সময় পথে উচ্চৈস্বরে তাকবীরাত পাঠ করা উচিত। রসুল আকরাম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "তোমাদের ঈদ সমূহকে তকবীরাতের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, তা হলো এই :

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। ওল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ও লিল্লাহিল হাম্‌দ)।"

উক্ত তাকবীরাত বিশেষভাবে ১০ই জিলহজ্বের ফজরের পর নামাজের পর হইতে ১২ই যিল-হজ্বের আসরের নামাজের পর পর্যন্ত উচ্চৈস্বরে পড়া উচিত। ঈতুল আজহার নামাজ যথাসম্ভব শীঘ্র এবং বিলম্ব না করিয়াই পড়া উচিত কেননা উহার পর কুরবানী করিতে হয়। ঈদের নামাজের সময় এক বর্শা সমান সূর্যোদয়ে আরম্ভ হয় এবং সূর্য কাত হওয়া পর্যন্ত পড়া যায়। আজকাল সেই অনুযায়ী ঘড়ির হিসাবে নির্ধারিত সময়ের পাবন্দি করা সকলের কর্তব্য। নামাজে-ঈদ খোলা ময়দানে পড়া শ্রেয়, এবং বাধাবাধকতায় মসমিদে বা সাধারণভাবে প্রশস্ত মসজিদে পড়া যাইতে পারে। সুবিধাজনকভাবে যেখানেই সম্ভব হয় সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ঈদের নামাজে আজান ও একামত নাই। ইমাম তকবীরে-তাহরীমার পর সানা পাঠ করিয়া প্রথম রাকাতে সাত বার উচ্চৈস্বরে তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন, এবং মুক্তাদীগণ অনৈচ্চস্বরে তাহা অনুসরণ করবেন। প্রত্যেক তকবীরের সঙ্গে দু'হাত কান পর্যন্ত উঁচু করে সোজা নীচের দিকে ছেড়ে দিবেন। সপ্তম তকবীরের পর হাত বাঁধতে হবে এবং ইমাম কারাত শুরু করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে কারাতের পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পাঁচবার তকবীর পাঠ করতে হয়। যদি ইমাম উক্ত তকবীরসমূহ বলতে ভুলে যান, তাহলে ভুলের প্রতিকার হিসাবে 'সেজদা সাহাভ' করা জরুরী হবে কিন্তু তকবীর-গুলির গণনায় ভুল হলে তাতে সেজদা সাহাভ করা জরুরী নয়। নামাজ আদায়ের পর ঈমাম ঈদ সম্পর্কে খোৎবা প্রদান করবেন। এই খোৎবা জুমার খোৎবার ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত। উভয়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য বসা উচিত কিন্তু মধ্যে না বসেই যদি খোৎবার উভয় অংশ সম্পন্ন করা হয় তাহলেও জায়েজ হবে। খোৎবা যেহেতু ঈদের নামাজের অংশ বিশেষ, সেজন্য উহা প্রত্যেকের মনোযোগ সহকারে শোনা আবশ্যকীয়। তারপর সম্মিলিত দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপরর পরস্পর ঈদের মিলন। ঈদের দুই রাকাত নামাজ সুন্নতে-মুয়াক্কাদা স্বরূপ। হযরত রসুল আকরাম (সাঃ আঃ) এরশাদ করেছেন যে, উহাতে পুরুষদের ব্যতীত মহিলারাও শামিল হবেন বরং ঈদগাহে বা মসজিদ সংলগ্ন বারান্দায় বা বাহিরে সে সকল স্ত্রীলোকও উপস্থিত থাকবেন, যাদের নামায নাই। তাঁরা খোৎবা শোনবেন এবং দোওয়ায় শামিল হবেন। এ প্রসঙ্গে আর এক হদিসে অনুরূপ তাকিদ পাওয়া যায়।

একজন মহিলা বললেন, "হে রসুলুল্লাহ, অনেক সময় আমাদের মধ্যে কারও নিকট পরদার উদ্দেশ্যে চাদর থাকে না। (সেকালে বোরকা ছিল না)। সেজন্য সে যদি ঈদে না যেতে পারে, তাহলে কি কোন দোষ হবে?" নবী করীম (সাঃ) বললেন :

لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن

অর্থৎ "তার সঙ্গের অন্য কেউ তাকে চাদার দিক, যাতে সেও নেককাজে শরীক হতে পারে"

ঈদের নামাজ শুধু জামাতের সহিতই হতে পারে। একা পড়া জায়েজ নয়। তেমনিভাবে এক ঈদগাহে দ্বিতীয়বার জামাত হতে পারে না। অর্থৎ, এক স্থানে একবারই ঈদের জমাত হবে, দ্বিতীয়বার নয়। যে ব্যক্তি আত-তাহিয়াতে সালামের পূর্বে জামাতে শামিল হতে পেরেছেন, তাঁর ঈদের নামাজ হয়ে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে পর তিনি উঠে নিজে দুই রাকাত সম্পন্ন করবেন এবং নিয়মানুযায়ী তকবীর সমূহও বলবেন।

ঈদুল আজহার নামেও যেমন ইঙ্গিত রয়েছে, এ উপলক্ষে পশু কুরবানী দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যার সামর্থ আছে তার নিশ্চয় কুরবানী দেওয়া উচিত। কুরবানীর জানোয়ার ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উহা যেন অসুস্থ, খোঁড়া, শিং ভাঙ্গা বা কান কাটা না হয়।

কুরবানীর জন্য খাসী বা বকরি কম পক্ষে এক বছরের এবং মেশ বা দুম্বা ছয় মাসের হতে হবে, তবে ভালভাবে পোশা ও হৃষ্ট-পুষ্ট যেন হয়, দুর্বল ও রোগা না হয়; গরুর বয়স কমপক্ষে দুই বৎসর এবং উটের পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত।

পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেওয়া কুরবানীতে, তা খাসী হোক বা গরু, সে পরিবারের অপরাপর সকলে শামিল গণ্য হবে। যার সামর্থ আছে সে একাধিক কুরবানীও দিতে পারে।

খাসী বা বকরি কুরবানী এক ব্যক্তির জন্য হয় এবং উহাতে পরিবারের অধিনস্থ সকলকে শামিল করতে পারে। গরু বা উটে সাত ব্যক্তি শামিল থাকে : ইমামগণের ধারণা গরুর এক অংশ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট।

যদি কেহ গরীবদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে চায় তবে উহাও সওয়াবের কাজ। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) উম্মতের গরীবদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিতেন। মৃত ব্যক্তি বা অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কুরবানী দেওয়া যায়

যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, সে যেন যিল-হজ্জের ১লা তারিখ থেকে কু বানী করা পর্যন্ত চুল না কাটায়। রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর এ-ই সুন্নত ছিল। কুরবানী ঈদের নামাজের পরে দিতে হবে। ঈদের নামাজের পূর্বে দেওয়া কুরবানী, কুরবানী হিসাবে গণ্য হয় না (উহা সাদকা গণ্য হয়)। ১২ই যিল-হজ্জ পর্যন্ত কুরবানী দেওয়া যেতে পারে কোন কোন ইমামের মতে ১৩ই যিল-হজ্জের আসর নামাজ পর্যন্ত কুরবানী হতে পারে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এবং আরও কতক বুজর্গের মতে যদি কোন ব্যক্তি সফরে থাকেন বা অন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং নির্ধারিত সময়ে কুরবানী দিতে না পারেন, তা'হলে গোটা যিল-হজ্জ মাসের মধ্যে যে কোন দিন দিতে পারেন।

কুরবানীর জানোয়ার নিজ হাতে কুরবানী করা (জবেহ করা) শ্রেয় এবং অধিক সওয়াবের কাজ কিন্তু অপারগতায় অন্যের দ্বারাও জবেহ্ করান যায়।

কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করা এবং গরীব-মিস্কিন-দেরকে খাওয়ান এবং মজুদ রাখাও জায়েয। উত্তম পন্থা হলো এই যে, এক অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা, এক অংশ নিজের জন্য রাখা এবং এক অংশ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট পাঠানো।

কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে নিজের জন্য খরচ করা যায় না। বিক্রয়মূল্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা আবশ্যকীয়।

কুরবানীর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এই যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে আলঙ্করিক (Pictorial) প্রকাশ-ভঙ্গিতে এ কথার অঙ্গীকার করাকে বুঝায় যে, হে খোদা! যেভাবে আমি এ জানোয়ারটি কুরবানী করছি, এবং যে 'যিব্হে আজীম'-এর স্মৃতি-চারণে এ কুরবানী দিচ্ছি, তেমনি আমি প্রয়োজনে সর্বদা আল্লাহর পথে আমার জান, মাল অথবা অন্য যে কোন প্রিয় বস্তু কুরবানী দেওয়ার নির্দিধায় কুরবান করে দেব। মোট কথা, এই কুরবাণীর দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্যিকার এখলাস, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং তকওয়া সৃষ্টি করাই মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন : لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

অর্থাৎ, "খোদাতায়ালার নিকট তোমাদের সেই তাকওয়া ও এখলাস পৌঁছায়, যা কুরবানী উপলক্ষে তোমাদের অন্তরে সক্রিয় হয়"

সুতরাং উক্ত আয়াতে আমাদেরকে কুরবানীর মাধ্যমে 'ইসলাহে নাফ্স' বা আত্ম-শুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আত্মশ্লাঘা, অহংকার, লোকদেখানো মনোভাব ও কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও বাসনা-কামনার সকল পথ পরিহার করে এবং আল্লাহতায়ালার সকল হুকুমের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন করার জন্য নির্দেশদান করা হয়েছে।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন :—

'যাহারা কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্বের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সত্যিকার হৃদ্যতা এবং পবিত্র নিয়তের সহিত কুরবানী দিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই সকল লোকই যেন তাহাদের সন্তান-সন্ততির কুরবানী পেশ করিয়াছে। তাহারা অতি মহান পুরস্কারের উপযুক্ত অধিকারী। আমাদের প্রিয় রসুল হযরত খাতামান নবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাঁহার পবিত্র বাণীতে এ মূলতত্ত্বের দিকই ইশারা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : "কুরবানী সমূহ এরূপ বাহন স্বরূপ, যাহা মানুষকে খোদাতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছায় (খোদাপ্রাপ্তি ঘটায়), পাপ মোচন এবং বিপদাবলী দূর করণের কারণ হয়।" (খোৎবা ইলহামীয়া)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহুল মওউদ (রাঃ) বর্তমান যুগে ঈদের এক অতি মহান লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলেছেন :

"আমাদের সব চাইতে বড় ঈদ তখনই হইবে যখন ইসলাম জগতের প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে এবং দুনিয়ার সকল প্রান্ত হইতে আল্লাহু আকবর ধ্বনী উত্থিত হইতে থাকিবে।"

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে ঈদুল আজহা সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য-কর্ম পালনের তওফিক দিন এবং ইহার সকল বরকত ও কল্যাণের ওয়ারিশ করুন। আমীন।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ
(সদর মুরুব্বী)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩৫)

পরকাল সম্পর্কে ঃ

ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম মূল বিষয় পরকাল সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্তধারনা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বহু লোক পরকালের উপর যথাযথভাবে বিশ্বাসই রাখে না। দ্বিতীয়তঃ যারা বিশ্বাস রাখে তাদের পরকাল সম্পর্কিত ধ্যান-ধারনা খুবই বিস্ময়জনক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেহেস্ত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ধারনা এই যে, বেহেস্ত হলো দৈহিক সুখ-সম্ভোগের জন্য একটি চরম ও পরম সুখকর স্থান—সেখানে রয়েছে অবারিত দৈহিক আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা—মদ, নারী ও সঙ্গীতের অফুরন্ত এবং এন্তার ব্যবস্থা। ভাবতে অবাক লাগে যে, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষানুযায়ী মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে উপরোক্ত ধ্যান-ধারনার বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। আল্লাহতায়া'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ٥

(ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়াবুদুন)

অর্থ:—"আল্লাহতায়ালার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই জিন ও ইনসান (অর্থাৎ সকল শ্রেণীর মানুষ) সৃষ্টি করা হইয়াছে।" (সুরা যারিয়াত : ৫৭)

আল্লাহতা'লার ইবাদত করার অর্থ হলো আল্লাহতা'লাকে মান্য করা, তাঁকে মান্য করার অর্থ হলো তাঁকে অনুকরণ করা এবং তাঁকে অনুকরণ করার অর্থ আল্লাহতা'লার গুনাবলীকে মানবীয় পর্যায়ে যতখানি সম্ভব আহরণের প্রচেষ্টা করা। ঐশী জীবনের অনুশীলন করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পরিণতি। এই পার্থিব জীবনে ৬০ থেকে ৭০ বছর ধরে ঐশী আদর্শে গুণান্বিত জীবন যাপনের শিক্ষা এবং অন্যদিকে পরলৌকিক জীবনে দৈহিক আরাম-উল্লাসের ধ্যান-ধারনা যেমন সামঞ্জস্যহীন, তেমনি বিস্ময়কর। বস্তুতঃপক্ষে দৈহিক ভোগ-বিলাসের জন্য বেহেস্ত তৈরী করা হয় নাই—বরং ঐশী গুণের অনুকরণ ও অনুশীলনের অফুরন্ত পরিধি এবং মহা-প্রয়াসের ব্যবস্থারূপেই বেহেস্তের সৃষ্টি।

অনুরূপভাবে অনেকে মনে করে যে, দোযখ কু-কর্মকারীদের জন্য স্থায়ী নিবাস স্বরূপ। এই ধারনাও ভ্রান্তিপূর্ণ। দোযখের বাসিন্দারা তাদের কুকর্মের জন্য শাস্তিভোগ ঠিকই করবে। কিন্তু সেই দোযখী জীবন চিরস্থায়ী হবে না। এই পৃথিবীতেও এই ধরনের চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও একদিন শেষ হয়ে আসে।

হযরত মীর্যা সাহেব অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং সমকালীণ অতুলনীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা দ্বারা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে পরকাল সম্বন্ধে এবং পরকালের জীবনের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, বেহেস্ত শুধুমাত্র রূপক বিষয় নয়, অথবা দৈহিক ভোগ-বিলাসেরও জায়গা নয়। কোন ভাল কাজ সম্পাদন করলে আমরা যে আনন্দ অনুভব করে থাকি তেমনি আনন্দের সঙ্গে বেহেস্তের আনন্দ উপভোগের উপমা দেওয়া যেতে পারে। মানবীয় ব্যক্তি-চরিত্রে দুটো প্রধান দিক হলো: দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক। মানবীয় সৃষ্টি-বীজে এই উভয়বিধ গতি-প্রকৃতি চিরন্তন ধারায় প্রবাহমান। সেই সৃষ্টি-বীজও একটি দেহ এবং আত্মার সমষ্টি মাত্র। মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং পূর্ণ বয়সে তার ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনের মধ্যে আত্মাও ক্রমাগতভাবে উন্নতিপ্রাপ্ত হতে থাকে। যে উন্নতির ধারা সৃষ্টি-বীজে সুপ্ত ছিল তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপভাবেই পরকালের জীবনে মানবীয় আত্মার উন্নতির গতিধারা ইহলৌকিক জীবনের আত্মিক উন্নতির চাইতে অনেক বেশী গভীর এবং ক্রমাগতভাবে গভীর হতে গভীরতর হতে থাকবে। এইভাবে বিবেচনা করলে পরকালের জীবনের ধারণা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য হতে পারে।

দোযখের শাস্তি সীমাহীন ভাবে চলবে না। এক সময়ে—আগেই হোক অথবা পরেই হোক সেই শাস্তি শেষ হবে। অবশ্য এই শাস্তি কু-কর্মকারীর প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে—কিন্তু চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। চিরস্থায়ী দোযেখর ধারণা মহা-করুণাময় আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো:

(ওয়া রাহমতী ওয়াসেয়াত কুল্লা শাইয়েন) ورحمتی وسعت کل شیء

অর্থ:—"আল্লাহতা'লার করুণা সকল জিনিষকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। (সুরা আরাফ : ৫৭)। এমন কি দোযখও তাঁহার করুণা দ্বারা পরিমণ্ডিত।"

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে: "এমন একটি সময় আসবে যখন কোন মানুষকেও দোযখে রাখা হবে না।" (কঞ্জুল উম্মাল)।

বেহেস্তের পুরস্কার সম্বন্ধে—পক্ষান্তরে বলা হয়েছে, فلهم اجر غير ممنون (ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন) "বেহেস্তের পুরস্কার সমূহ এমন পুরস্কার হবে যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।" (সুরা তীন : ৭)।

চরম পন্থীদের সম্বন্ধে:

ইসলামের মূল বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো কতকগুলো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা প্রকার বিভ্রান্তিমূলক এবং অশোভনীয় পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেকেই চরম পন্থায় আসক্ত হয়ে মনে করে যে,

মৌখিকভাবে "কলেমা" পাঠ করাই যথেষ্ট। তারা মনে করে যে "কলেমা" ঘোষণার পর এক ব্যক্তি যা ইচ্ছা কাজ করলে কিছুই ক্ষতি হয় না। কারণ তাদের মতে কলেমার বরকতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাদের জন্য শেফায়েতকারী হয়ে তাদেক রক্ষা করবেন। তাদের হাস্যকর যুক্তি হলো এই যে, দুনিয়াতে যদি কোন পাপীই না থাকে, তবে কার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) শেফায়াত করবেন।

কোন কোন লোক মনে করে যে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রেক্ষিতেই বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় কর্তব্য সমূহ নিরূপিত হয়েছে এবং সেই প্রেক্ষিতে যে সকল বাহ্যিক অবস্থা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগে প্রয়োজনীয় ছিল বর্তমান যুগে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। তারফলে তারা মনে করে যে, সে যুগের ন্যায় এখন অজু, প্রাত্যহিক পাঁচবারের নামায, নামাযের মধ্যস্থিত সিজদা, বাৎসরিক একমাসকালীন রোজা—এই সকল বিষয় অপ্রয়োজনীয়। তাদের কথা হলো—এখন মানুষ তার আভ্যন্তরীণ ভাল-মন্দ অবস্থার প্রতি নিজেই খেয়াল রাখতে পারে, যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে সক্ষম—এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

আর এক শ্রেণীর লোক অন্য ধরণের চরম পথ ও পন্থার কথা বলে। তাদের মতে 'নাজাত' বা পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে—ছোট-বড়ো সকল বিষয়ে অবিকলভাবে অনুকরণ করতে হবে। তিনি যে সব কাজ করেছেন শুধু তাই নয়, তিনি যেভাবে করেছেন তাও সার্বজনীন এবং চিরস্থায়ীভাবে অনুকরণ করতে হবে। অর্থাৎ তিনি যে পোষাক পরেছিলেন, তিনি যেভাবে চুল রেখে-ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই সকল মুসলমানকে অনুকরণ করতে হবে।

আর এক শ্রেণীর লোক মনে করে যে, বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় কর্তব্য-কর্ম বলতে কোন কিছুই নেই। পবিত্র কুরআনে যে সকল কর্তব্য-কর্মের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো—তাদের মতে শুধু ব্যাপক অর্থে পালনীয় এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শ ও শিক্ষার বিস্তারিত অর্থ তাদের কাছে ততটা প্রাসঙ্গিক নয়।

হযরত মীর্যা সাহেব চরম পথ ও পন্থার অনুসারীদের সামনে ইসলামী শিক্ষার সত্যিকার রূপ উন্মোচিত করেছেন। তিনি প্রাত্যহিক জীবনে একজন খাঁটি মুসলমানের অনুকরণীয় কর্তব্য-কর্মের সঠিক রূপরেখা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতা বা অবহেলা প্রদর্শনের মারাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে তিনি সকলকে সতর্ক করেছেন। অন্যদিকে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "ইচ্ছাকৃতভাবে" পাপ করার পরেও কেহ যদি কেয়ামতের দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শাফায়তের আশা করে তবে সেই আশা নিরর্থক। বস্তুতঃপক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহতায়ার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করবেন যে ব্যক্তি পাপ-কর্ম পরিহারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে।

'অবুদিয়ত' বা আভ্যন্তরীন আত্ম-সমর্পনই হলো মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি এবং 'শরীয়ত' বা বাহ্যিক আত্ম-সমর্পন হলো সেই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা বিশেষ। অবুদিয়তের পদ্ধতি সীমাহীন এবং সেজন্য অবুদিয়তের সঙ্গে সমতালে চলতে হলে বাহ্যিক আত্ম-সমর্পনকেও সীমাহীন ভাবে অগ্রসর হতে হবে। পবিত্র কুরআন উল্লেখিত এই শিক্ষার প্রতিই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জোর দিয়ে বলে : 'রাব্বে যিদনী এলমা' অর্থাৎ হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও'। অন্য কথায়, কিছু জ্ঞান লাভের পর আমরা আরো জ্ঞান লাভের জন্য এবং তারপরও অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য দোওয়া করতে পারি।

হযরত মীর্যা সাহেব আরো শিক্ষা দিলেন যে, মানবীয় কর্ম দু প্রকারের হয়ে থাকে— (১) ইবাদত সম্পর্কিত কর্ম বা সার্বজনীন কর্ম এবং (২) ঐ সকল কাজ-কর্ম যেগুলো স্থানীয় পরিবেশে অথবা ব্যক্তি বিশেষের বাসস্থান অথবা সম্প্রদায়ের প্রভাবে পরিপুষ্ট। প্রথমটির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে অনুকরণ করা কর্তব্য। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তাঁকে সর্বতোভাবে অনুকরণ করতে কাউকে বাধ্য করা অন্যায় হবে। কারণ, এই সকল ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে সাহাবীগণও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পরিবেশ বা প্রজাতির নিয়ম অনুসরণ করতেন (যে সকল নিয়ম বা কাজ-কর্ম ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয় সেই সকল বিষয়ে)। যেমন, সাহাবীগণের একে অন্যের মধ্যেও পোষাকে-পরিচ্ছদে, চুলের ষ্টাইলে—এই ধরণের বিষয়ে পার্থক্য ছিল এবং তজ্জন্য তাঁরা একে অন্যকে সমালোচনা করতেন না।

হযরত মীর্যা সাহেব প্রচলিত আরো একটি ভ্রান্ত ধারনার সংস্কার করেন। অনেকে মনে করে যে, যেহেতু হযরত রসুল করীম (সাঃ) আমাদের মতই মানুষ ছিলেন সেই-জন্য তাঁকে মান্য করার কোন প্রয়োজন নেই। এই ধারনার সংস্কার করে হযরত মীর্যা সাহেব বল্লেন যে, নবী-রসুলগণকে আল্লাহতা'লা বিশেষ জ্ঞান দান করেন যার মাধ্যমে তাঁরা ঐশীবাণীর মর্মার্থ এবং উদ্দেশ্যাবলী সাম্যকভাবে উপলাব্ধ করতে সক্ষম হন এবং এই কারণে তাঁদের ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনের প্রতি সকলকে প্রশ্নাতীত মান্যতা প্রদর্শন করতে হবে। যদি আমরা সমাগত রসুলকে মান্য করতে অস্বীকার করি তাহ'লে আমরা নিজেরাই আমাদের ঈমানের ক্ষতি সাধন করবো। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।)

☞ "নেক কাজে একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর।" —আল-কুরআন

ওফাতে ঈসা

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উর্দু কবিতার বঙ্গানুবাদ]

কসম হকের হয়েছেন গতায়ু ইবনে মরিয়ম।
জন্নাতবাসী হয়েছেন নিশ্চিত সেই মোহতারম ।।
মারিছে ফুৎকার সুনিশ্চিতভাবে তাঁহারে।
মরণের তাঁর দিতেছে খবর উহাযে ।।
মরণ গণ্ডির বাহিরে তিনি যান নি রহিয়া।
সাব্যস্ত ইহা কুরআনের ত্রিশ আয়াত দিয়া ।।
প্রকৃতি বিরোধী কথায় হায় এ কেমন হোশ।
চিন্তায়া দেখ যদি রাখ কোনো হোশ ।।
মরেছে সবে শুধু তিনি গেছেন বাঁচিয়া।
গায়ে আজও লাগেনি তাঁর মরণের ছোঁয়া ।।
তৌহীদে হকের কি ছিল ইহাই মর্ম বাণী।
যার উপর যুগ যুগ মোরা গৌরব মানি ।।
মানুষে আরোপ এমন খোদায়ী নিশান।
বাঁচাও বাঁচাও হতে এমন ঈমান ।।
কুরআনের তালীম কি, ভাল, ছিল ইহাই।
কিছু ভয় খোদার মোদের থাকা তো চাই ।।
ধর্ম তো আমি রাখি মুসলমানের।
অন্তর হতে খাদেম আমি খাতামুল মুরসালীনের ।।
শেরক এবং বেদাত হতে বেজার আমি।
আহমদ মুখতারের পথের খাক আমি ।।
সকল হুকুম পরি রাখি আমি ঈমান।
মন প্রাণ মম সব এই পথে কুরবান ।।
দিয়াছি দিল এবে দেহ মাটির বাকী।
ইচ্ছা ইহাই হউক উহাও সাথী ।।

অনুবাদ : মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

সংবাদ

ইউরোপ সফরান্তে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর রাবওয়া প্রত্যাগমন

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রুশ ভঙ্গ কনফারেন্সে যোগদান এবং ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অতীব সাফল্যজনক ও কল্যাণকর তবলিগী ও তরবিয়তী সফর শেষে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে মঙ্গলমত ১১ই অক্টোবর ১৯৭৮ইং (মোতাবেক ১১ই ইখা ১৩৫৭ হিঃ শাঃ) রোজ বুধবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে রাবওয়া পৌঁছিয়াছেন। আল-হামদু লিল্লাহ। হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল।

হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁহার এই মোবারক ও ঐতিহাসিক সফরে ৮ই মে ১৯৭৮ ইং তারিখে রাবওয়া হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন। উক্ত সফরে হুজুর ইংলণ্ডের জামাত আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনায় ২রা, ৩রা ও ৪ঠা জুন ১৯৭৮ইং তারিখে লণ্ডনে কমনওয়েলথ ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাফল্যমণ্ডিত কাসরে-সলীব (ক্রুশ-ভঙ্গ) আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন এবং ইউনাইটেড কাউন্সেল অফ চার্চেস-এর জবাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং স্বভাবিক মৃত্যু বরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খৃষ্টান জগতকে আলোচনার আহ্বান জানাইবার পর চারি মাসেরও অধিক কাল ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক ব্যাপী সফর করেন। উল্লেখিত দেশগুলিতে অবস্থিত আহমদীয়া জামাত সমূহের সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের দ্বীনি ও রুহানী উন্নতি ও ঐ সকল দেশে ইসলামের প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দান করেন এবং সম্বর্ধনা সভা ও সংবাদিক সাক্ষাৎকারে ভাষণদান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইউরোপবাসীকে ব্যাপকভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছান। উল্লেখিত প্রতিটি দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় হুজুর আকদাসের ফটো সহ ভাষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। নরওয়ে এবং ফ্রান্সে দুইটি নতুন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

হুজুর (আইঃ) ৮ই অক্টোবর স্থানীয় সময় ৩ঘটিকায় লণ্ডন হইতে K. L. M. বিমান যোগে রওয়ানা হইয়া ৪ঘটিকায় এমস্টারডম (হল্যাণ্ড) পৌঁছেন। সেখান হইতে পরবর্তী দিন ১২ ঘটিকায় রওয়ানা হইয়া রাত ২ ঘটিকায় করাচী পৌঁছেন। বিমান বন্দরে করাচী এবং সিন্ধের অন্যান্য অনেকগুলি জামাতের আমীর এবং কয়েক শত আহমদী আহবাব হুজুরকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাবওয়া হইতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গও সেখানে গিয়া ছিলেন। ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যায় করাচীর আহমদীয়া হলে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় আহমদীগণের সমাবেশে হুজুর আকদাস (আইঃ) দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এক ঈমানবর্ধক ভাষণ দান করেন।

১১ই অক্টোবর দ্বিপ্রহরে P. I. A. বিমান যোগে রওয়ানা হইয়া হুজুর সাড়ে তিন ঘটিকায় লাহোর পৌঁছেন। সেখানকার জামাতের বিপুল সংখ্যক আহ্‌বাবকে সাক্ষাৎ-দানের পর সন্ধ্যা পৌনে ছয় ঘটিকায় হুজুর মোটরকার যোগে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটে আল্লাতায়ালার ফজলে মঙ্গলমত রাবওয়া পৌঁছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। সেখানে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ও বহিরাগত আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-কে আন্তরিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তখন সফরের ক্লান্তির জন্য হুজুরের সহিত কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই সাক্ষাৎলাভ করেন। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ নিয়মিত দোওয়া জারী রখিবেন, আল্লাহতায়ালা যেন হুজুরকে স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং আল্লাহতায়লার সার্বক্ষণিক সাহায্য ও হেফাজতে গালবায়ে-ইসলামের মহান উদ্দেশ্যে সার্বিক সাফল্য দান করেন। আমীন। (দৈনিক আল ফজল, রাবওয়া হইতে সংকলিত)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

ওক্‌ফে-জদীদ চাঁদার গুরুত্ব

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) বলেন :

"প্রত্যেক আহমদী বালক-বালিকাকে ইসলামের আহমদী সৈনিকে পরিণত করা মাতা-পিতা ও অবিভাবকগণের কর্তব্য। সুতরাং আপনাদের উচিত এই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং ওক্‌ফে-জদীদের অ র্থিক জেহাদে প্রতিটি আহমদী ব চ্চাকে শামিল করা, যাহাতে আল্লাহতায়ালার রহমত আপনাদের উপর নাজেল হয় এবং যাহাতে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় যেজন্য হযরত মুসলেহ মওউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু) আঞ্জুমানে ওক্‌ফে-জদীদ কায়েম করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন।"

যেহেতু ওকফে-জদীদের চলতি মাসের শেষ হইতে মাত্র দুই মাস বাকী আছে সেইহেতু সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির দৃষ্টি ওক্‌ফে জদীদের চাঁদা সত্বর আদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করান যাইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে, বিগত কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় হুজুরের ফয়সালা অনুযায়ী ১৫ বৎসর অনুর্ধ প্রত্যেক আহমদী শিশুর পক্ষ হইতে ১২ টাকা হিসাবে ওক্‌ফে জদীদের চাঁদা ধার্য হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক আহমদীকে তাহার সন্তানদের পক্ষ হইতে উপরুক্ত হারে এবং নিজের ও পরিবারের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য অধিক আর্থিক কুরবানী করার তওফিক দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিন দিন ব্যাপী ৭ম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

ঢাকা: ৩০শে অক্টোবর—পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সপ্তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় ইজতেমা (সম্মেলন) বিশেষ সফলতার সহিত গতকাল সম্পন্ন হইয়াছে। এই মহান ইজতেমা গত শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৮ সন মোতাবেক ২৭শে এখা ১৩৫৭ হিঃ শাঃ জুময়ার নামাযের পর আরম্ভ হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২৫টি মজলিস হইতে খোদ্দাম ও আতফালের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তেলাওয়াতে কুরআনে পাক ও খোদ্দামের আহাদনামা পাঠের পর ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ইজতেমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। খোদ্দাম এবং আতফালের তালিম ও তরবীয়তের বুৎপত্তি সাধনের জন্যই এই ইজতেমা। নেযামের ইতায়াত (আনুগত্য) সম্বন্ধে বক্তব্য রাখিতে গিয়া তিনি বলেন, বয়াতের অর্থ হইল 'বিক্রি' হওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মসমর্পনের এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর এতায়াতের কথা উল্লেখ করেন।

মোহতারম আমীর সাহেব বলেন—আমরা ব্যক্তি-পূজায় বিশ্বাসী নহি, খলিফার ইতায়াত হইল রসুলের ইতায়াত এবং রসুলের ইতায়াত মানে আল্লাহতায়ালার প্রতি ইতায়াত। ব্যক্তি-পূজা হইল পীর-ফকিরের পূজা—ইতায়াতে-নেজাম বা ইতায়াতে-খলিফার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। কেননা খলিফার এবং নেযামে-খেলাফতের ইতায়াতে সকল প্রকার ত্যাগ ইসলামের ঐশী পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ক্ষেত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বার্থে নিয়োজিত বা ব্যয়িত হয় না তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামায় বর্ণিত মারুফ ফয়সালার উল্লেখ করিয়া বলেন, খলিফা ফানা, বাকা ও লেকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পুর্ণ আত্মসমর্পন করিয়াছেন। তাই তিনি খোদাতায়ালার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, তাঁহার ফয়সালা সবই মারুফ ফয়সালা। বয়াতের দশ শর্ত দ্বারা 'মারুফ ফয়সালা' সুরক্ষিত। তাই বয়াতকারীকে নিজস্ব বুদ্ধির দুয়ার বন্ধ করিয়া খলিফার পূর্ণ ইতায়াত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং নেজামে-খেলাফত হেফাজত করিবার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি জোর দিয়া বলেন যে, আমাদের আহাদ পাঠ করিবার তাৎপর্য মূলতঃ খলিফার প্রতি পূর্ণ ইতায়াতের স্বীকৃতি। ইজতেমার পূর্ণ সফলতার জন্য তিনি দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন।

উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব্ সদর ইজতেমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, সারা দুনিয়া আজ জামাতে আহমদীয়ার যুবকদের প্রতি তাকাইয়া আছে। সারা দুনিয়ার সংশো-

ধনের ভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত। তাই তাহাদিগকে প্রথমে সংশোধিত হইতে হইবে —ইসলামী রঙে রঙিন হইতে হইবে—ইসলামের শিক্ষা পরিপূর্ণ-ভাবে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। সত্যিকার অর্থে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই খলিফা তথা নিযামের ইতায়াত করিতে হইবে।

ইজতেমার কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান যেমন, কুরআন তেলাওয়াত, নজম পাঠ, বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর (দলীয়ভাবে), দ্বীনি মালুমাত (ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান) এবং খেলাধূলা ছাড়াও তরবীয়তি আলোচনা এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক আলোচনার আয়োজন করা হইয়াছিল। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, সর্বজনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মুহম্মদ খলিলুর রহমান, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, আলী কাসেম খান চৌধুরী, গোলাম আহমদ খান এবং মৌঃ মুতিউর রহমান যথাক্রমে উসওয়ায়ে হাসানা, খতমে নবুয়ত, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, তালীম ও তরবীয়তের প্রয়োজনীয়তা, শানে রসুল আরাবী (সাঃ), রুশুম ও রেওয়াজ, হাদিসের আবশ্যকতা, যিকরে হাবিব এবং নামাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'খৃষ্টান সিরাজুদ্দিনের চারটি প্রশ্নের উত্তর', 'ইসলামী নীতি-দর্শন' এবং 'মসীহ হিন্দুস্থান মে" এই তিনটি পুস্তকের উপর যথাক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব আমীর হোসেন, আব্দুল জব্বার এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। ইহা ছাড়া কুরআনের দরস এবং মালফুজাতের দরস দেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। হাদিসের দরস দেন এবং নামায তাহাজ্জুদ পড়ান মৌঃ আজহার সাহেব, মোয়াল্লেম এবং বিভিন্ন তত্ত্বাবধানের কাজ করেন জনাব আব্দুল মান্নান, মুয়াল্লেম ও জনাব ইস্রাইল দেওয়ান, মোয়াল্লেম আল্লাহ্তায়ালা সকলকে যাজায়ে খায়ের দান করুন।

রবিবার (২৯/১০/৭৯) মাগরিবের নামাযের পর সমাপ্তি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ইতায়াতে খিলাফত ও নেযাম খেলাফতের আরও বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া তাঁহার সারগর্ভ ও ঈমান বর্ধক সমাপ্তি ভাষণ দানের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী খোদ্দাম এবং আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯৭৭—৭৮ সনের উত্তম মজলিস হিসাবে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা মজলিসকে প্রথম এবং জামালপুর (ময়মনসিংহ) ও তেজগাঁও মজলিসকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাজেটকৃত পূর্ণ চাঁদা আদায়কারী মজলিস গুলিকে "সনদে ইমতিয়াজ" প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ঢাকা মজলিস—১৩টি, ময়মনসিংহ মজলিস—৫টি, তেজগাঁও মজলিস—৩টি, নারায়ণগঞ্জ মজলিস—২টি, জামালপুর (ময়মনসিংহ) মজলিস—৬টি, কুমিল্লা মজলিস—১১টি, তেরগাতি মজলিস—৪টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস ৬টি, চট্টগ্রাম মজলিস—১টি, চাঁদপুর মজলিস—১টি, পাবনা মজলিস—২টি, বীর পাইকসা মজলিস—১টি, এবং হোসনাবাদ মজলিস—১টি, পুরস্কার পায়। আল্লাহতায়ালা তাহাদের চেষ্টায় বরকত দিন এবং সুফল দান করুন। (সনদে ইমতিয়াজ প্রাপ্ত মজলিস সমূহের এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে)।

খাকসার—

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান,

মোতামদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Mohammad Ali Anwor